সমাজতন্ত্র (Socialism)

প্রথমেই আমাদের ‘সমাজতন্ত্র’ কথাটির অর্থ বুঝে নিতে হবে। ‘সমাজতন্ত্র’ বলতে বোঝায়, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন এক দার্শনিক মতবাদ, যা সমাজস্থ সকল মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদির মালিকানা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, বণ্টন ইত্যাদির দায়িত্ব ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের বা রাষ্ট্রের ওপর অর্পণ করার পক্ষপাতী। অর্থাৎ সহজ কথায় বলা যায় ‘সমাজতন্ত্র’ হল সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার ওপর ‘রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদ মতবাদ’।

প্রাচীনকালেও বিভিন্ন দার্শনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ‘সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে’র উল্লেখ করেছেন। যেমন প্লেটো, অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র সংক্রান্ত মতবাদে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করে সমাজ বা রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সমাজ বা রাষ্ট্র সংক্রান্ত মতবাদ অভিজাততান্ত্রিক (Aristocratic), সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) নয়, বিত্তবান ও অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থের সুরক্ষাই তাদের মতবাদের প্রাধান লক্ষ্য। কামার, কুমোর, মুচি, মেথর, শ্রমিক, কৃষক, কারিগর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

‘সমাজতন্ত্র’-এর ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগে, বিশেষ করে বর্তমান যুগেই সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদ হিসাবে সমাজতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রবাদ উপস্থাপিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতে, পাশ্চাত্যে শিল্প-বিপ্লবের ফলে, যে পঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা পায়, সমাজতন্ত্র তারই বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের দাবি হল - ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ‘অবাধ বাণিজ্য নীতি’র প্রচলন করা। ঐ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ উচ্ছেদ করে শিল্পপতি ও বাণিজ্যপতিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু মানুষ ক্রমশঃ উপলব্ধি করে যে, অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে কেবল পঁজিপতিরাই লাভবান হয়, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা হয় না। শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে পুঁজিপতিরা কেবল লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, জনকল্যাণমূলক উৎপাদন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি নয়।

কতকগুলি শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যকীয়রূপে দেখা দেয়। যেমন, পরমাণুশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে, পুঁজিপতিদের ওপর পরামাণুশক্তি উৎপাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত হলে, তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। তেমনি আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে 'সর্বধিক মানুষের সর্বাধিক হিত' সাধন অপেক্ষা সাম্যনীতিকে বেশী প্রাধান্য দিতে হয় এবং ঐসব ক্ষেত্রে শিল্প উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত না হলে চলে না। যেমন, জনবিরল পার্বত্য অঞ্চলে বায়ুপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার অথবা জনবিরল অঞ্চলের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়-দায়িত্ব পুঁজিপতিদের ওপর অর্পিত হলে তা, লাভজনক না হওয়ায়, অবহেলিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য এসব কাজের দায়িত্ব তাই রাষ্ট্রকেই বহন করতে হয়।

এসব কারণে, শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে পাশ্চাত্যের অনেক চিন্তাবিদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রকে জনকল্যাণমূলক মতবাদরূপে প্রচার করেন। এঁদের মতে, জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বা উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে হবে, যেখানে পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বন্টনের সমস্ত ব্যবস্থাই হবে রাষ্ট্রায়ত্ত, যেখানে সমাজ বা রাষ্ট্রই হবে দেশের সব সম্পদের মালিক এবং তার রক্ষণ, বন্টন ইত্যাদি সবই সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। সামাজিক সব অসাম্য ও অশান্তির মূলে হচ্ছে - পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্খা। এর ফলে সমাজস্থ মানুষ বিবদমান দুটি গোষ্ঠীতে - ধনী-দরিদ্র, বিত্তবান-বিত্তহীন, পুঁজিপতি ও সর্বহারা, মালিক ও শ্রমিক ইত্যাদি দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য (এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক বৈষম্যও) ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জনকল্যাণমূলক কোন সমাজেই এই বৈষম্য বাঞ্ছনীয় নয়। এই বৈষমের অবসান ঘটাতে হলে, সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত লাভের পথকে বিনষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত মালিকানা ও লাভের উৎসের উচ্ছেদ ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা গেলে সমাজ বা রাষ্ট্রই হবে সকল কিছুর মালিক। জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মালিক। এমন অবস্থায় সমজের সম্পদ, সমাজের লভ্যাংশ, সমাজস্থ সব মানুষের মধ্যে, তাদের শ্রমের বিনিময়ে, সমভাবে বণ্টিত হবে এবং মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয়ে এক সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে।

উক্তরূপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

১) সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিক মতাদর্শ সরকারিভাবে স্বীকার করা হয় এবং তা অনুসরণ করা হয়। অধ্যাপক বল এই প্রসঙ্গে বলেন, 'There is an official socialist ideology'।

২) এই ব্যবস্থায় একটি মাত্র শ্রেণীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণী হল শ্রমিক ও কৃষকের সর্বহারা শ্রেণী। এই সর্বহারার একনায়কত্বই হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩) এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিকক শ্রেণী থাকে না বলে শ্রেণীশোষণ বা শ্রেণী-দ্বন্দ্বও থাকে না। সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব নাথাকার দরুণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। দেশের সকল শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী মানুষ একটি মাত্র সাম্যবাদী দলের মাধ্যমে নিজেদের পরিচালিত করে। একে কমিউনিস্ট দল বলা হয়।

৪) এই কমিউনিস্ট দলই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারকে পরিচালিত করে। সর্বক্ষেত্রেই এই দলের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫) উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার শোষণের সূত্রপাত করে। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এরকম অধিকার স্বীকার করা হয় না। সমাজের ধন-সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন ও পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার অস্বীকৃত হওয়ায় শোষণের কোন সুযোগ থাকে না।

৬) অন্যান্য রাজনীতিক ব্যবস্থার মত এখানে সরকারী ও বে-সরকারী উদ্দ্যোগের মধ্যে তেমন পার্থক্য থাকে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বে-সরকারী সংগঠনসমূহ সরকারের দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

৭) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থের পরিবর্তে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখানে ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজকে বড় করে দেখা হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণাকে স্বীকার করা হয় না। সকল কাজ সমষ্টিগত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। সমষ্টিগতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন হয়। এই ধরনের ব্যবস্থায় ব্যক্তিপূজা বা নেতৃত্ব পূজার কোন স্থান নেই।

৮) অর্থনৈতিক সাম্য ও সকল প্রকার শোষণের অবসান, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুপন্থী শিক্ষাসংস্কৃতি ও বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৯) সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতা থাকে। তাই জনসাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগের প্রকৃত ও পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। সেইজন্য সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার যথার্থ উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই নাগরিকের সর্বঙ্গীন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত।

১০) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণসংযোগের মাধ্যমগুলি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

১১) এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১২) ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভীতি প্রদর্শন, হিংসা, সন্ত্রাস প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

১৩) সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের গণতন্ত্রের মূলকথা হল আইনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্মে জনসাধারণের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সর্বহারার একনায়কত্বে এই সর্বহারার গণতন্ত্র হল প্রকৃত গণতন্ত্র।

১৪) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনৈতিক বাবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতিতে বিশ্বাসী। এই ব্যবস্থা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী।

১৫) সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে স্বীকার করা হয় না। আর এই কারণের জন্য এখানে বিচার-বিভাগের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীনতার নীতিকেও স্বীকার করা হয় না।

সমাজতন্ত্রের দোষ

সমাজতন্ত্রবাদ কোন নির্দোষ মতবাদ নয়। কারণ -

১) এই মতবাদে সমাজ বা রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির কাজ হল, তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে সমাজের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করা। এ এক চরমপন্থী মতবাদ। ব্যক্তিকেই নিয়েই সমাজ। ব্যক্তির কল্যাণকে অগ্রাহ্য করলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণও ব্যাহত হয়। ব্যক্তির বিকাশ ও উন্নতি হলে তবেই সমাজের সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নতি সম্ভব। ব্যক্তির স্বার্থকে অস্বীকার করলে সমাজের স্বার্থও উপেক্ষিত হয়।

২) মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সমাজতন্ত্র এক ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ। সম্পত্তির প্রতি মানুষের কামনা এক স্বাভাবিক কামনা। অনেক পশুর মধ্যেও ধন-সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল (MecDougall) প্রাণীর এই প্রবৃত্তিকে 'সহজাত'(innate) বলেছেন। সহজাত এই প্রবৃত্তির বশে মানুষ 'নিজের' বলে কিছু পেতে চায়- তার ভালবাসার ধনকে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে, বাড়িঘর, জমিজমা, আসবাবপত্র ইত্যাদি পেতে চায়। নিজ ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানুষের যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তা অন্যত্র লক্ষ্য করা যায় না। সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের কথা বলে মানুষের সহজাত কর্মপ্রেরণাকে নিরুৎসাহিত করে।

৩) প্রকৃতির ভেদনীতিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। সব উদ্ভিদ, সব পশু, সব মানুষ একরকমের নয়। মানুষে মানুষে যে ভেদ আছে তাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। সব মানুষের কর্মসামর্থ্য ও চিন্ত করার সামর্থ্য সমান নয় - কারও কম আবার কারও বেশী। নারী ও পুরুষের মধ্যে শরীরগত ও মনোগত ভেদ অনস্বীকার্য। সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রকৃতির এই ভেদ-নীতিকে অগ্রাহ্য করে সব মানুষকে সমান মর্যাদার অধিকারী বলেছেন। কিন্তু বাস্তবত সব মানুষ যখন সমান দক্ষতা ও চিন্তার অধিকারী নয়, তখন সেই অধিকারভেদে মর্যাদা ভেদও স্বীকার করতে হয়। দক্ষ ও দক্ষতাহীন মানুষ সমান মর্যাদার অধিকারী হলে সমাজে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা পায় না।

কাজেই, ব্যক্তিকে তার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে তবেই সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাদের অস্বীকার করে নয়, - আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

ইউটোপিয়ান (বা কাল্পনিক) সমাজতন্ত্র
(Utopian Socialism)

কার্লমার্কস্ পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রবাদীদের সাধারণত কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী বলা হয়। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্করহিত। যদিও আভিধানিক অর্থে 'ইউটোপীয়' বলতে বোঝায় বাস্তব অথবা কাল্পনিক, সর্বদোষমুক্ত কোনসমাজ বা রাষ্ট্র বা দেশ বা অঞ্চলকে। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে টমাস্ মোর (Thomas More) এমন এক দ্বীপের কল্পকাহিনীর উল্লেখ করে তাঁর গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'ইউটোপীয়' (Utopia)।

পরবর্তীকালে বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের কয়েকজন দার্শনিক ও সমাজসংস্কারক মোরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এক আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রব্যাবস্থার উল্লেখ করেন যেখানে বিত্তবান বা বিত্তহীনদের মধ্যে পুঁজিপতি ও দরিদ্রদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই, যেখানে প্রেত্যকেই সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থে নিজেদের নিয়োজিত করে এবং জীবন ধারণের উপযোগী যাবতীয় কিছু লাভ করে এবং সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করে। সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পর্কে এসকল দার্শনিক ও সমাজসংস্কারকের অভিমতকেই বলা হয় 'ইউটোপীয়ান সমাজতন্ত্রবাদ'। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদের সমর্থক ও প্রচারকরূপে তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এঁরা হলেন, ফ্রান্সের শাঁ সিমো (Saint Simon), চার্লস ফুরিয়ে (Charles Fourier) এবং ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) । কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) অবশ্য এঁদের মতবাদকে 'ইউটোপীয়ান' বলার পরিবর্তে 'সবিচার ইউটোপীয়ান সমাজতন্ত্রবাদ' (Critical Utopian Socialism) বলার পক্ষপাতী।

ইউরোপে নবজাগরণের পটভূমিকায় যে সকল মহান নেতা ফরাসী বিপ্লবের অনুকূলে মানুষের মনের ক্ষেত্রকে রচনা করেন তাঁরা বিপ্লবকে সর্বাত্মক অর্থে গ্রহণ করে সমাজে প্রচলিত সকল কিছুকে বিচার-বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করেন। তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্যানধারণা, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি সকল কিছুকে বিচার-বুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা করে তাদের অন্ধসংস্কার প্রসূত, অমঙ্গলজনক, উৎপীড়নমূলক ইত্যাদিরূপে চিহ্নিত করেন এবং মানুষের ন্যায্য অধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের পথ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সকল মহান নেতারা যে স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকারের কথা বলেন তা কেবল মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিদের (যাদের মধ্যে ছোটোখাটো শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষক) স্বার্থেরই সুরক্ষা করে, সমাজের সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে না। এজন্য ফরাসী বিপ্লবের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিদের কাছে পরাজিত হলেও সমাজের প্রশাসন-ব্যবস্থার বা গঠন কাঠামোর তেমন কোন পরিবর্তন হয় না - কেবল মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিরাই তাদের সম্পদ ও শক্তির বৃদ্ধি ঘটিয়ে, পূর্ব প্রথা অনুসারে নিঃস্ব জনগণের ওপর উৎপীড়ন করে চলে। মানব দরদী মহান নেতাদের বিচার-বুদ্ধি-ভিত্তিক কাঙ্খিত সমাজের প্রতিষ্ঠা বাস্তবত সম্ভব হয় না এবং ফরাসী বিপ্লব এক ব্যর্থতার ইতিহাসে পরিণত হয়।

বিপ্লবের পরবর্তীকালের ফ্রান্সের অরাজক সমাজব্যবস্থার বর্ণনা এঙ্গেলস্ যেভাবে করেছেন তা আমরা নিম্নে নামমাত্র উল্লেখ করার চেষ্টা করছি।

বুদ্ধি-বিচার ভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ সন্ত্রাসবাদে পর্যবসিত হয়। স্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের আতঙ্কে পরিণত হয়। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পাবার পরিবর্তে ক্রমশঃই তীব্র হতে থাকে। পঁজিপতি নির্ভর পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশাকে স্বাভাবিক সামাজিক ঘটনারূপে গণ্য করা হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ধন-বিনিময়ের সম্পর্কে পরিণত হয়। অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিপ্লববাদীদের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দ্বন্দ্ব সংঘাত ও শত্রুতার আকার নেয়। গণিকাবৃত্তি অভূতপূর্বভাবে সমাজকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। বৈবাহিক সম্পর্কের আবরণে নারীদের ব্যভিচারের মূল্যবান সামগ্রীরূপে গণ্য করা হয়। সহজ কথায় দার্শনিকদের প্রতিশ্রুত বিচার-বুদ্ধি নির্ভর সমাজ এক নৈরাশ্যজনক পরিহাসে পরিণত হয়।

সমাজ বা রাষ্ট্রের এরূপ অরাজক অবস্থার অবসানে ফ্রান্সের কয়েকজন তাত্ত্বিক, বিশেষ করে শাঁ সিমোঁ, চালর্স ফুরিয়ে এবং ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন 'ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন, যেখানে সমাজব্যবস্থা হবে আদর্শ, যেখানে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যজনিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকবে না - যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের কর্তৃত্বাধীনে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করবে। তবে এই সময়কার অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তীকালীন সমাজে বা রাষ্ট্রে বিবদমান দুটি গোষ্ঠীর - মালিক ও শ্রমিক গোষ্ঠীর - চরিত্র সুষ্ঠুভাবে প্রকটিত না হওয়ায় 'ইউটোপীয়ান' সমাজতন্ত্রবাদীরা তা উপলব্ধি করতে না পেরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল মানুষের শুভ-বুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেই তাই দ্বন্দ্ব-সংঘাতমূলক বিপ্লবের পথকে পরিহার করে শান্তির পথ ধরে লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছেন নানান পরীক্ষ-নিরীক্ষার দ্বারা।

দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের দ্বারা তাঁদের ইউটোপীয়ান সমাজতন্ত্রের সারবত্তা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সমাজের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের ওপর, ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর নির্ভশীল না হওয়ায় সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এদের মতবাদকে 'বৈজ্ঞানিক' বিশেষণে বিশেষিত করার পরিবর্তে 'কাল্পনিক'' বা 'ইউটোপীয়ান' বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। এঁদের প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত বা আধা-বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্ন্তগত হওয়ায় তাঁরা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিতেই সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন, বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে নয়।

এখন আমরা এঁদের মতাবাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন বাবে আলোচনা করতে পারি। প্রথমে শাঁ সিমোঁ বক্তব্য।

ক) শাঁ সমোঁ (১৭৬০ - ১৮২৫) ঃ ফরাসী বিপ্লবের সময় ইনার বয়স ছিল অনুর্ধ্ব তিরিশ, কাজেই তিনি বিপ্লব পূর্ববর্তী ও বিপ্লব পরবর্তীকালীন উভয় সমাজের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বিপ্লবের ফলে অবসরভোগী শ্রেণী (idle class), তৃতীয় বর্গ (third estate) বা বিপুল জনতার কাছে, যাদের অর্ন্তগত হচ্ছে উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ পরাভূত হয়। কিন্তু থার্ড এস্টেটের জয় ছিল আসলে 'বিপুল জনতার' (great mass) এক ক্ষুদ্র অংশের, সুবিধাভোগী পুঁজিপতিদের জয়। এমন আবস্থায় বিত্তবান পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। বিত্তবানরা অধিকতর রাজনৈতিক সুবিধার অধিকারী হওয়ায় বিত্তহীন দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশঃই পুঞ্জিভূত হতে থাকে।

সামাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই এই বৈষম্যের মূল কারণরূপে সিমোঁই সর্বপ্রথম চিহ্নিত করেন। সিমোঁ স্পষ্টভাবে বলেন যে রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর নির্ভশীল। কাজেই, সিমোঁর অভিমত হল - সমাজে বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হলে, রাজনৈতিক সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান। এর জন্য প্রয়োজন, রাজনীতির মতো অর্থনীতিকেও সমাজ বা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা - রাজনীতির সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাকেও সমাজ বা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন করা। সিমোঁর এই অভিমতের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের মতো সিমোঁ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলেছেন যে, আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল কিছুকেই ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে।

সিমোঁ আদর্শ শিল্প-সংস্থার প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনুকরণে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। বিশেষ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য যেমন কোন শিল্প-সংস্থার মালিক-শ্রমিক তাদের বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব পরিত্যাগ করে যথা-কর্তব্য সাধন করে এবং উৎপাদন কার্যে উন্নতি অব্যাহত রাখে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থাও সেইরকম হলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন সংঘাত দেখা দেয় না এবং রাষ্ট্রের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

শিল্প-সংস্থার অনুকরণে সিমোঁ সমাজ বা রাষ্ট্রের তিনটি কক্ষের উল্লেখ করেছেন। প্রথম কক্ষ ‘হাউস অফ ইনভেন্সন’ (house of invention), যার কাজ হবে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা, দ্বিতীয় কক্ষ ‘হাউস অফ এগ্জামিনেশন্’ (house of examination), যার কাজ হবে প্রণীত আইনগুলি অনুমোদন বা অননুমোদন করা; এবং তৃতীয় কক্ষ ‘হাউস অফ এগ্জিকিউশন্’ (house of execution), যার কাজ হবে অনুমোদিত আইনগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

উল্লেখযোগ্য যে সিমোঁ শিল্প-সংস্থার মডেলে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, সেখানে মালিক ও শ্রমিকের, শাসক ও শাসিতের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অপনীত করার জন্য অবলম্বনীয় নির্দিষ্ট কোন পন্থা-পদ্ধতির উল্লেখ করেন নি, কেবল সংঘাতের পথ পরিহার করে তাদের সহযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রসর হতে বলেছেন। সিমোঁ নিজে ছিলেন থার্ড এস্টেট বা তৃতীয় বর্গের মধ্যবিত্তদের মধ্যে একজন তাত্ত্বিক এবং সম্ভবত সেই কারণেই পুঁজিপতিদের স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারেন নি।

খ) চার্লস ফুরিয়ে (১৭৭২ - ১৮৩৭) ঃ

বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্সের সমাজ ও রাষ্ট্রের শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করে ফরাসী তাত্ত্বিক চার্লস ফুরিয়ে এক আদর্শ সমাজব্যবস্থার উল্লেখ করেন। ফুরিয়ে তাঁর অসাধারণ লেখন-শৈলী ও অননুকরণীয় বিদ্রুপাত্মক ভাষায় তৎকালীন সমাজের চিত্র অঙ্কন করেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক অনাচার ও নৈতিক ব্যভিচারের উল্লেখ করেন। বিপ্লব পূর্ববর্তীকালীন দার্শনিকদের জনগণের প্রতি আশার বাণী যে বিপ্লব পরবর্তীকালে মিথ্যা ছলনায় পরিণত হয় তা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। বিপ্লব-পূর্ববর্তীকালে মনবতাবাদী দার্শনিকরা জনগণকে যে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন - তা হল বিপ্লবের জোয়ারে মানুষের চিত্ত হবে কলুষমুক্ত, এবং তার ফলে এমন এক সভ্যতার আবির্ভাব ঘটবে যেখানে মানুষের অন্তর হবে শুদ্ধ, আনন্দ হবে দীর্ঘস্থায়ী, পূর্ণতা হবে অসীম ও অনন্ত।

কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পরিণাম এক শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ফুরিয়ে বিপ্লব পরবর্তী সমাজের বাস্তব অবস্থাকে নির্দেশ করে বলেন যে, দার্শনিকদের আশার বাণী অবশেষে উচ্চ-নিনাদ বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়। বুর্জোয়াদের নীতিহীন আগ্রাসী মনোভাব, অপরকে বঞ্চনা করার অপচেষ্টা, ফাটকাবাজী, নারী স্বাধীনতা অগ্রাহ্য করে তাদের মহার্ঘ পণ্যরূপে ব্যবহার - ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতার পরিচায়ক। ফুরিয়ে সমাজের স্থিতাবস্থার জন্য, সমাজের অগ্রগতির জন্য, নারী-স্বাধীনতার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

মানব সমাজের বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তাই ফুরিয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান। ফুরিয়ে সমাজের পরিবর্তন ও বিবর্তনকে চারটি মূল পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন এগুলি হল ঃ ১) বন্য (savagery), ২) বর্বর (barbarism), ৩) পিতৃতান্ত্রিক (patriarchal) ও সর্বশেষ ৪) সভ্য (civilization)। এ যাবৎ সমাজ বা রাষ্ট্র এই চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। শেষোক্ত 'সভ্য' স্তর বলতে ফুরিয়ে তৎকালীন বুর্জোয়া সমাজকে বুঝিয়েছেন। ফুরিয়ে মনে করেন যে, বর্বর সমাজের সহজ সরল প্রত্যেকটি দোষ বর্তমান তৎকালীন সভ্য সমাজে (বুর্জোয়া সমাজে) ব্যাপক ও জটিল আকারে নানাভাবে প্রকটিত হয়ে চলেছে। বুর্জোয়া সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল নানা দ্বন্দ্ব ও বিরোধীতার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হওয়া। বর্তমান সভ্যতা কেবল সমস্যার সৃষ্টি করে সমাধান করে না। বর্তমান সভ্যতা লক্ষ্য বস্তুর পরিবর্তে অলক্ষ্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়।

বুর্জোয়া সভ্যতার দুর্নীতিগ্রস্ত এই অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে ফুরিয়ে এক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার, সমাজতন্ত্রের কল্পনা করছেন। সিমোঁর মতো ফুরিয়েও বিপ্লব ও সংঘাতের পথ পরিহার করে এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধির কাছে আবেদন করে আদর্শ সমাজ গঠনের প্রস্তাব করেছেন। ফুরিয়ে এমন আশা পোষণ করেছেন যে, মানুষের শুভ-বুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে এমন সমাজ গড়া আবাস্তব কিছু নয়, যেখানে মালিক ও শ্রমিক, বর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের নিয়োজিত করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে সার্থক করবে। ফুরিয়ে যে প্রণালীর মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা হল -

আদর্শ সমাজ হবে গোষ্ঠী-ভিত্তিক এবং ঐ সকল বিভিন্ন গোষ্ঠি কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসন-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। পঁচশত পরিবার নিয়ে গঠিত হবে এক একটি গোষ্ঠী বা ফ্যালাঞ্জ (phalansteres) বা গৃহ উপনিবেশ (home colonies) প্রত্যেক গোষ্ঠীতে থাকবে নানা শ্রেণীর মানুষ - পুঁজিপতি, শ্রমজীবি ও অন্যান্য জীবিকার মানুষ। প্রত্যেককে সমাজকল্যাণমূলক কর্মে নিযুক্ত থাকতে হবে। শিল্প-সংস্থার পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করতে হবে। উর্ধ্বতম ও নিম্নতম বেতন নির্দিষ্ট থাকবে। নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত শ্রম নিষিদ্ধ হবে। জরুরী ও বিপজ্জনক কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। ফ্যালাঞ্জের অর্ন্তগত প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্প্রীতির সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। আর এভাবে বসবাসের ফলে মানুষের স্বভাব পরিশুদ্ধ হবে এবং ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, বিপ্লব পরবর্তীকালে বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্রটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না পাওয়ায় ফরাসী তাত্ত্বিকগণ সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণটি চিহ্নিত করতে পারে নি এবং একারণে সিমোঁ ও ফুরিয়ের মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে নি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে মূল শক্তি যে সর্বহারা শ্রমজীবী শ্রেণী, ফরাসী তাত্ত্বিকগণ তা অনুধাবন করতে না পেরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল মানুষের শুভবুদ্ধির কাছেই আবেদন জানিয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য-ভিত্তিক না হওয়ায় এঁদের সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত মতবাদ ‘এক কপোল কল্পিত কাল্পনিক মতবাদ’-এ পর্যবসিত হয়েছে।

গ) রবার্ট ওয়েন (১৭৭১ - ১৮৫৮) ঃ

ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতার ফলে সেখানকার বুর্জোয়া সমাজ যেমন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, ইংলণ্ডেও তেমনি শিল্প-বিপ্লবের ফলে সেখানকার সমাজজীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কারের পর বড় বড় কলকারখানার ও শিল্প-নগরীর পত্তন হয় এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট শিল্প ও কৃষি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকরা তাদের জীবিকার সন্ধানে শিল্পনগরীতে উপস্থিত হয় এবং প্রভূত শ্রমের বিনিময়ে স্বল্প পারিশ্রমিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পশুদের মতো জীবন-যাপন করে। ধন-বৈষম্যের ফলে সমাজজীবন ব্যাধিগ্রস্ত হয় - সাবেকী নৈতিক বোধের, মূল্যবোধের অবসান ঘটে। মানুষ নানাবিধ অসামাজিক, অনৈতিক ও অমানবিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কলকারখানার নারী ও শিশুদের শ্রমিকরূপে নিয়োগ করে তাদের অতিরিক্ত শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। পারিবারিক বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ে।

দেশের এমন অবস্থায় ২৯ বৎসর বয়স্ক এক সরল, সৎ ও মহান চরিত্রের জননেতার আবির্ভাব ঘটে - রবার্ট ওয়েন। ওয়েন জড়বাদী দর্শনের একজন সমর্থক। তাঁর মতে মানব চরিত্র একদিকে যেমন বংশগতির দ্বারা প্রভাবিত, অন্যদিকে তেমনি পরিবেশের দ্বারা, বিশেষ করে তার বৃদ্ধি ও বিকাশকালীন পরিবেশের দ্বারা, প্রভাবিত। মানুষ জন্মসূত্রে শান্তিপ্রিয়; কিন্তু শিল্প-সংস্থার দুর্নীতিমূলক পরিবেশের জন্যই শিল্পপতি ও শ্রমিকের চরিত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রকাশ পায় এবং পণ্য উৎপাদনও ব্যাহত হয়। উৎপাদন-শিল্পের পরিবেশ দূষণমুক্ত ও উন্নত করা গেলে ওয়েন বিশ্বাস করেন যে, মালিক-শ্রমিক চরিত্রের উন্নতি ঘটবে এবং তখন তারা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পথ পরিহার করে, ব্যক্তিগত লাভ-অলাভের চিন্তা না করে, কেবল সংস্থার উন্নতির চিন্তা করবে। স্পষ্টতই ওয়েন যে 'ইউটোপীয়ান' সমাজতন্ত্রের কথা বলেন তা হল, সম্প্রদায়গত এক যৌথ জীবন, যেখানে মুক্ত পরিবেশে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের সকলে সম্প্রদায়ের সেবায় নিযুক্ত থাকবে।

এপ্রকার ইউটোপীয়ান সমাজতন্ত্র যে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে তা প্রদর্শনের জন্য ওয়েন এক সুযোগও লাভ করেন - ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্কটল্যান্ডের নিউ ল্যানার্ক (New Lanark in Scotland) অঞ্চলে একটি তুলার কারখানার একজন পরিচালকরূপে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। ওয়েন তাঁর মতাদর্শ অনুসারে কারখানাটি পরিচালনা করে দেখান যে - সমবেত প্রচেষ্টায়, আন্তরিক সহযোগিতায়, মালিক-শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে এক আদর্শ সংস্থা গড়া কাল্পনিক নয়, তা একান্তই বাস্তব। কারখানাটির পরিবেশ দুষণমুক্ত করার পর দেখা যায়, ক্ষুদ্র জনবিরল অঞ্চলটিতে ক্রমশঃই জনসমাগমের ফলে অঞ্চলটির জনসংখ্যা বেড়ে হয় ২৫০০ - মদ্যপায়ীরা মদ্যপান ত্যাগ করে - অপরাধের সংখ্যা এতই হ্রাস পায় যে পুলিসের বা ম্যাজিস্ট্রেটের বা আইন-আদালতের কোন প্রয়োজন মানুষ অনুভব করে না।- ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ হয় - নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এসবেরই মূলে হচ্ছে - অঞ্চলটির মুক্ত পরিবেশে মানুষকে মানবাধিকারের সুযোগ দেওয়া।

ওয়েন শিল্পাঞ্চলটিতে শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, বিদ্যালয়ের পরিবেশকে গৃহ পরিবেশের মতোই মনোরম করতে হবে, যেখানে এই অঞ্চলের প্রতেক শিশু দুই বৎসর বয়ঃক্রমকাল থেকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করবে। ওয়েন শ্রমিক আইনের ও পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্ব নির্ধারিত ১৩/১৪ ঘন্টার পরিবর্তে শ্রমিকদের কেবল ১০ ঘন্টা শ্রম দেওয়ার কথা বলেন। কোন এক সময় তুলা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ওয়েন তখন কারখানার কোন আয় না থাকলেও সকল শ্রমিককে দীর্ঘ চার মাসকাল পুরো বেতনের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন এবং তা করেছিলেন কারখানার কোন অর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি না করে। তার কারণ হিসাবে বলা যায় মুক্ত পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে দেওয়ার জন্য তারা মনের আনন্দে এতই নিষ্ঠা সহকারে কারখানার কাজ করে যে কারখানার মুনাফা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

আর তার দ্বারাই তিনি তাদের চার মাস যাবৎ কার্যত বসিয়ে বসিয়ে বেতনের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে মানুষকে উপযুক্ত পরিবেশ দিলে, মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ দিলে, সকল মানুষ তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পথ পরিহার করে সমাজতন্ত্রের পথকে সুগম করে, আর এটাই করে দেখিয়েছেন মানবতাবাদী ওয়েন তাঁর কারখানা পরিচালনার মাধ্যমে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াদের অত্যাচারে তাঁর এই প্রচেষ্ট ফলপ্রসূ হয় নি। তাঁর ওপর অনেক অত্যাচার নেমে আসে। কিন্তু তাহলেও ওয়েন তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকেন।

উক্তরূপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের কতকগুলি মূল বৈশিষ্ট্য জেনে নিতে পারি।

১) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ হল মূলত একটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ। অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠানসমূহের, বিশেষত শিল্পকারখানা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে এই মতাদর্শের আর্বিভাব ঘটেছে। ইংরেজ চিন্তাবিন্ রবার্ট ওয়েনের অভিমত অনুসারে বিদ্যমান কারখানা ব্যবস্থা প্রতিযোগিতার ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সহযোগিতামূলক কারখানা-ব্যবস্থার মাধ্যমেএই সকল অসুবিধার অবসান সম্ভব।

২) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীরা সমাজের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। শ্রমিক শ্রেণীর জীবন ধারা মান তাঁদের ব্যথিত করেছে। এই কারণে বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এক নতুন সামাজিক কাঠামোর কথা বলেছেন।

৩) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধিতা করা হয়েছে। চিন্তাবিদ্ প্রুধোঁ (Proudhon) ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে চৌর্য বলে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। সাইমন ও ওয়েন দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে দায়ী করেছেন। চিন্তাবিদ্ গ্রের অভিমত অনুযায়ী শ্রমিক শ্রেণী যে সম্পদ সৃষ্টি করে, লোভী মালিক শ্রেণী তা আত্মসাৎ করে। এই শ্রেণীর কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের মতানুসারে দারিদ্র্যের মূল কারণ হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সমাজের সকল সীমাবদ্ধতার মূলেও ঐ ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

৪) বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাসমূহের অপসারণের ব্যাপারে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের পরিকল্পনা পৃথক প্রকৃতির। এই মতাদর্শের প্রবক্তাদের অভিমত অনুসারে ভবিষ্যতের নতুন সমাজব্যবস্থা ও জনসম্প্রদায় ন্যায়বিচার-নীতিবোধ এবং সততা-সরলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীরা পঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরোধীতা করেন না; তাঁরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাসমূহের বিরোধীতা করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাসমূহের অবসানের ব্যাপারে তাঁরা মার্কসীয় উপায়-পদ্ধতিকে সমর্থন করেন না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে তাঁরা বৈপ্লবিক বা রাজনৈতিক কার্যকলাপকে সমর্থন করেন না। তাঁরা ন্যায়বিচার ও কল্যাণমূলক আদর্শের ভিত্তিতে আদর্শ ও স্থায়ী জনসম্প্রদায় গড়ে তোলার কথা বলেন। এইভাবে সৃষ্টি হবে এক আদর্শ সমাজের। এই সমাজ হবে সহযোগিতামূলক। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের অভিমত অনুযায়ী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থার অবসান বিবর্তনমূলক পরিবর্তন ও সামাজিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সম্ভব। এক্ষেত্রে তারা মানবিকতাবোধ, ন্যায়নীতিবোধ ও যুক্তিবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৬) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, সাম্য ও সম্প্রীতির পরিবেশে মানুষের বসবাস করার কথা। শোষণ-পীড়ন এবং সব ধরনের সংঘাত-সংঘর্ষ প্রকৃতির নির্দেশের বিরোধী।

৭) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদে এক বিশেষ ধরনের শিল্প-সমাজের পরিকল্পনার কথা বলা হয়। এই শিল্প-সমাজে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য বর্তমান থাকবে। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় কেউ অপরের পরিশ্রমের ফলের ওপর জীবন ধারণ করতে পারবে না।

৮) বিদ্যমান সমাজ-ব্যবস্থার বৃহৎ শিল্প-শক্তিসমূহ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে কিনা, এ বিষয়ে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীরা মোটেই চিন্তিত নন। তাঁরা মোটামুটিভাবে সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদ (Scientific Socialism or Socialistic Socialism) কার্ল মার্কসের মতবাদ (Theory of Karl Marx)

আমারা দেখতে পাই যেকোন মতাবাদ তার পূর্ববর্তী কোন-না-কোন মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। কার্ল মার্কসের সমাজ সম্পর্কিত মতবাদটিও পূর্ববর্তী উইটোপীয়ান সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইউটোপীয়ান সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ বা বর্জনের মধ্য দিয়ে মার্কস তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ, কষ্ট ও সীমাহীন দারিদ্র্যের উল্লেখ করলেও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠর জন্য কোন সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন নি।। কার্ল মার্কস সমাজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার-বিশ্লেষণ করে ঐ পথের সন্ধান দিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, পুঁজিবাদী সমাজের পঁজিপতি ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই সর্বহারা-শাসিত সমাজের অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

পুঁজিপতিদের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে তাদের অন্তরশুদ্ধির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে - উইটোপীয়ান সমাজতন্ত্রবাদীদের এ এক ভিত্তিহীন প্রত্যাশামাত্র। অবাস্তব কল্পনার ওপর নির্ভর করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে না। সমাজ-চিন্তাকে হতে হবে ইতিহাস-ভিত্তিক ও তথ্য-নির্ভর। বস্তুময় পরিবেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঠিক পথটি নির্ধারণ করতে হবে। এঙ্গেলস তাই বলেন, 'সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন তাকে বস্তুনিষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠা করা'। সমাজচিন্তাকে কল্পনার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্ত করে বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মার্কসের সমাজতন্ত্রকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বলা হয়।

সমাজের পরিবর্তন ও সেই পরিবর্তনের চরিত্র সম্পর্কে মার্কসের বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে বিশেষ করে দুটি আবিষ্কার সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি হল ঃ ১) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Materialistic interpretation of History or Historical Materialism) ২) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Surplus Value) - মার্কসের এই মতাবাদের জন্যই সমাজ সংক্রান্ত তাঁর মতবাদ 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমরা এখন মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রসঙ্গে উক্ত দুটি তত্ত্বের স্বরূপ জেনে নিতে পারি।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ঃ মার্কসীয় দর্শন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নামে খ্যাত। মার্কস তাঁর পূর্ববর্তী জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের দ্বান্দ্বিক ভাববাদের দ্বান্দ্বিকতাকে গ্রহণ করলেও ভাববাদ পরিহার করে বস্তুবাদ সমর্থন করেন। হেগেলের মতবাদ অনুসারে ভাব বা চিন্তাই পরমার্থসৎ, যার অভিব্যক্তি ঘটে দ্বান্দ্বিকতার মাধ্যমে - বাদ(Thesis), বিবাদ(Anti-thesis) ও বিসম্বাদের (Synthesis) মধ্য দিয়ে। প্রথম যে ভাব বা চিন্তাটি প্রকাশ পায় তা বাদ, যা তার স্বভাব-ধর্ম অনুসারে এক বিরোধী চিন্তা প্রতিবাদকে আকর্ষণ করে।

এই দুটি বিপরীতধর্মী প্রত্যয় বাদ ও বিবাদ পরস্পরকে অস্বীকার না করে তারা উভয়ে এক উচ্চতর প্রত্যয় বিসম্বাদে মিলিত হয়। বিসম্বাদটি আবার কালক্রমে বাদে পরিণত হয় এবং তারই মধ্য থেকে বিপরীত প্রত্যয় বিবাদের উৎপত্তি হয়; সে দুটি বিপরীত প্রত্যয় আবার কালক্রমে উচ্চতর বিসম্বাদে মিলিত হয়। এভাবেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চলে ভাব বা চিন্তার অন্তহীন অভিব্যক্তি। এই অন্তহীন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই অভিব্যক্ত হয় বস্তুজগৎ, জীব জগৎ এবং সমাজের উত্থান-পতন, অর্থাৎ সমগ্র জগতের ইতিহাস। কাজেই হেগেলের মতে, সমাজস্থ মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, তার ধর্ম, নীতি, দর্শন প্রভৃতি সব কিছুই মানুষের ভাব বা চিন্তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। মানুষের ভাব বা চৈতন্যই সামাজিক জীবরূপে তার অস্তিত্ব ও অবস্থানকে নির্ধারিত করে। হেগেলের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণও বলেন যে, মানুষের ভাব বা চেতনাই সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি।

মার্কস ইতিহাসের এই ভাববাদী ব্যাখ্যাকে বাতিল করে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মার্কসের মতে, মানুষ যে পরিবেশে বাস করে সেটাই হল তার বস্তুময় সত্তা, আর ঐ সত্তাই মানুষের সামগ্রিক জীবনকে, তার ধ্যান-ধারণাকে, নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষেরে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, নীতি, দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি সবই বস্তুগত সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন। কাজেই মার্কসের মতে, 'পারিপার্শ্বিক অবস্থার বস্তুগত সত্তাই মানুষের ভাব বা চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানুষের ভাব বা চেতনা ঐ বস্তুগত সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে না' - মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এটাই হল সারকথা। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের অভিমত হল, 'মার্কসের এই তত্ত্বই ইতিহাসকে তার সঠিক ভিত্তির ওপর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেছে। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, অপরের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে - রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি চর্চার পূর্বে মানুষের প্রথম এবং মৌল প্রয়োজন তার খাদ্য-পানীয়-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য জীবিকার সংস্থান'।

মার্কসের অভিমত হল, বিশেষ ধরনের বস্তুগত পরিবেশে অবস্থানই(social being) মানুষের সামাজিক চেতনার (social consciousness) উৎস। 'বস্তুগত পরিবেশ' বলতে মার্কস বিশেষ করে 'সমাজের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকেই' বুঝিয়েছেন। মানুষের বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির কোনটাই আকস্মিক নয়; এসবের মূলে হচ্ছে মানুষের মৌল চাহিদার পরিতৃপ্তিসাধন - স্পৃহা। ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মৌল চাহিদার পরিতৃপ্ত হয় না। মৌল চাহিদা হল - খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-পানীয় ইত্যাদি। এই মৌল চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে বিশেষ ধরনের উৎপাদন ও বণ্টন ববস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়, যাকে মার্কস 'অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা' বলেছেন। এই অর্থনৈতিক-ব্যবস্থার মধ্যেই মানুষের সামাজিক অবস্থান (social being) নিহিত এবং এই প্রকার সামাজিক অবস্থানই মানুষের সামাজিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। মার্কস এজন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজের 'মৌল কাঠামো' (super structure) বলেছেন।

হেগেলের ভাববাদ গ্রহণ না করলেও তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সাহায্যে মার্কস সমাজের পরিবর্তন ও বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন। দাস-সমাজ থেকে সভ্য সমাজ পর্যন্ত যে কোন সমাজ ব্যবস্থাকে 'বাদ' (thesis) বলা যেতে পারে। প্রচলিত সেই সমাজ-ব্যবস্থা তার অর্ন্তনিহিত কারণ বা স্বভাবের জন্য এক বিরোধী শক্তি 'বিবাদ'(antithesis)কে আকর্ষণ করে এবং কালক্রমে সেই 'বাদ' ও 'বিবাদ' মিলিত হয়ে ভিন্ন এক সমাজ-ব্যবস্থাকে, 'বিসম্বাদ' (synthesis) কে প্রতিষ্ঠা করে। ঐ 'বিসম্বাদ' আবার 'বাদ'এ পরিণত হয়ে একইভাবে অগ্রসর হয়। আর এভাবেই চলে সমাজ-ইতিহাসের পরিবর্তন ও বিবর্তন। জীববিজ্ঞানী ডারউইন (Darwin) তার জীবজগতের অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে যেমন বলেন, আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে একই জাতি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে, মার্কসও তেমনি, ডারউইনের বৈজ্ঞানিক মতবাদকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন যে একই সমাজ-ব্যবস্থা বাদ, বিবাদ ও বিসম্বাদের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে।

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে, সমাজের প্রতিটি পর্যায় এক বস্তুগত পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে (বাদ) - উৎপাদন কার্যে যুক্ত মূলত দুটি শ্রেণীর মানুষ - শ্রমিক ও মালিক শ্রেণী (প্রথমটি সমাজের মূল উৎপাদিকা শক্তি আর দ্বিতীয়টি উৎপাদন-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক) - প্রতিটি পর্যায় এক বিশেষ ধরনের পাস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতি স্থির হয়ে থাকে না- তার গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে- যেমন, লাঙ্গল থেকে ট্রাক্টর, ট্রাক্টর থেকে উন্নত ছোট যন্ত্রপাতি, ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি থেকে বাষ্পচালিত বৃহদাকার যন্ত্রপাতি ও কারখানা, ইত্যাদি। এজাতীয় পরিবর্তনের ফলে সমাজের স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হয়, মূল উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ শ্রমিক ও উৎপাদন-ব্যবস্থার নিয়মন্ত্রক অর্থাৎ মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্যরূপে দেখা দেয়, যাকে বলা যেতে পারে ‘বিবাদ’। উৎপাদন-ব্যবস্থার অর্ন্তগত এই মৌলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকেই মার্কস ‘শ্রেণীদ্বন্দ্ব’(class struggle) নামে অভিহিত করেছেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের Manifesto of the Communist Party গ্রন্থের প্রথম কথাটিই হল, ‘এ যাবৎ সমস্ত মানব সমাজের ইতিহাস এক শ্রেণী দ্বন্দ্বের ইতিহাস’।

এই শ্রেণী-দ্বন্দ্বই, মার্কসের মতে, সমাজ-পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ফলেই প্রত্যেক পর্যায়ের সমাজ এক উন্নতর সমাজ ভিন্ন সমাজে পরিণত হয় - সেই উন্নতর সমাজ ব্যবস্থাকে 'বিসম্বাদ' বলা যেতে পারে। কিন্তু সেই উন্নত সমাজ ও তার অর্ন্তনিহিত উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার জন্য কালক্রমে সমাজ এক বিরোধী শক্তিকে আকর্ষণ করে শ্রেণীদ্বন্দ্বের (বিবাদের) কারণ হয় এবং এভাবেই চলে সমাজের বিবর্তন ও পরিবর্তন। উৎপাদন-ব্যবস্থাগত মৌলিক শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ফলেই দাস সমাজ সামন্ত সমাজে, সমান্ত সমাজ পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত হয়েছে এবং ঐ দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশ 'বিপ্লব'-এর মধ্য দিয়ে একদিন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

মার্কস মনে করেন যে, এযাবৎ সমাজের প্রতিটি স্তরে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব থাকলেও, প্রতিকূল পরিবেশের কারণে শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হতে পারে নি এবং তার ফলে তারা সর্বাত্মক বিপ্লবের পথ ধরে শ্রেণীহীন সমাজের অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়নি। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাটি পূর্ববর্তী স্তর অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির - পুঁজিপতিদের শোষণ যেমন চরম পর্যায়ে পৌঁচেছে, আবার যোগাযোগ ব্যাবস্থা ও প্রচার মাধ্যমের প্রভুত উন্নতির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণী সুসংবদ্ধ হবার সুযোগ লাভ করেছে।

কাজেই, মার্কসের দৃঢ় বিশ্বাস যে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের সর্বাত্মক বিপ্লবের ফলে একদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবসান হবে, উৎপাদন ব্যবস্থা সর্বহারাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে এবং সমাজে শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে। বিষয়টিকে এঙ্গেলস যেভাবে বলেছেন তা হল - 'বিপ্লবের ফলে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণীসাশনের অবসান ঘটিয়ে দাসত্ব ও শোষণ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করবে। বুর্জোয়াদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্রমশক্তিকে আয়ত্ত করে প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যেকে ঐ শক্তিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে এবং উৎপাদিত সেই সম্পদকে (ব্যক্তিগত সম্পদ নয়) সকলের মধ্যে বন্টন করবে।

২) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of SurplusValue) ঃ

সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে মার্কসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল, সম্পদ ও শ্রমের মধ্যে মূল সম্পর্ক নির্ধারণ অথবা বলা যায় বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা কিভাবে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে তা নির্ধারণ করা। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশ ও গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূল লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন। এই উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করে। পঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই শ্রমিক শোষণের প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা পাওয়া যায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বে। মার্কসীয় দর্শন অনুসারে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল বনিয়াদ। রাজনৈতিক উপরি-কাঠামো (super structure) তার ওপরই গড়ে ওঠে। ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মার্কস অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়েছেন। আর উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব হল মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল কথা।

এখন আমাদের জানতে হবে উদ্বৃত্ত মূল্য বিষয়টি কি? মূল্যের শ্রম তত্ত্ব (Labour theory of value) -এর সূত্রপাত ঘটেছে অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। মার্কস মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে বিকশিত করেছেন। তাঁর মতানুসারে পণ্য উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম-সময়ের ভিত্তিতে তার মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিকের শ্রম-মূল্য আছে। যে-কোন পণ্যের মত শ্রমশক্তিরও বিনিময় মূল্য আছে। পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক শ্রম-সময়ের দ্বারা বিনিময় মূল্য (value in exchange) নির্ধারণ করা হয়। শ্রমিকগণ শ্রমের দ্বারা যে দ্রব্য উৎপাদন করে তার সমপরিমাণ মজুরী পায় না। উৎপাদন সামগ্রীর বিনিময় থেকে যে পরিমাণ মজুরী শ্রমিককে দেওয়া হবে না অর্থাৎ বঞ্চিত করা হবে, তা হল উদ্বৃত্ত মূল্য।

জীবনধারণের জন্য শ্রম-শক্তি বিক্রয় করতে শ্রমিক বাধ্য। কিন্তু সেই শ্রম-শক্তির দ্বারা শ্রম-প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট মূল্য এবং শ্রম-শক্তির মূল্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। শ্রমিকের মোট শ্রম-সময় দুভাগে বিভক্ত ঃ ১) সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় এবং ২) অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়। সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময়ের মূল্যটুকু শ্রমিককে দেওয়া হয়। সেই মজুরীর মূল্য তার নিজের এবং পরিবারের জীবনধারণের উপায়ের মূল্যের সমান হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের মজুরী থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করা হয় অর্থাৎ মোট শ্রম-সময়ের মাত্র একটি অংশের মূল্য শ্রমিক ভোগ করে। শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য বা মজুরীর উসুল হয়ে যাওয়ার পর এই মূল্য পাওয়া যায়। তাই এই মূল্যকে উদ্বৃত্ত-মূল্য বলা হয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন হল এক অনিবার্য নিয়ম। পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার উৎস হল এই উদ্বৃত্ত-মূল্য। পঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক নির্দিষ্ট মজুরীর চুক্তিতে পুঁজিপতি বা শিল্পপতির কাছে শ্রম শক্তি বিক্রয় করে। নিজের এই নির্দিষ্ট মজুরীর সমান মূল্য সৃষ্টির জন্য শ্রমিককে যতক্ষণ কাজ করতে হয়, সেই সময়কে আবশ্যিক শ্রমসময় বলা হয়। শ্রমিকের এই শ্রম-সময় আবশ্যিক।

তার কারণ শ্রমিকের এবং তার ওপর নির্ভরশীল পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রয়মূল্য সৃষ্টি করতে এই শ্রম-সময় অবশ্যই ব্যয় করতে হয়। বাকী সময়ে শ্রমিক কোন মজুরী ছাড়াই মালিকদের জন্য যে শ্রম করে তার একটা অংশ সে মজুরী হিসাবে পায়। বাকী অংশ মালিক শ্রেণী উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ আবশ্যিক শ্রম-সময় এবং উদ্বৃত্ত শম্র-সময়ের যোগফলই হল মোট শ্রম-সময়। মোট শ্রম-সময়ে সৃষ্ট পণ্যমূল্য - মোট শ্রমসময়ের মজুরীর মূল্য = উদ্বৃত্ত মূল্য। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে মালিকশ্রেণী শ্রমিক শোষণ কায়েম করে। পুঁজিপতি মালিক শ্রেণী শ্রমিকের ওপর শোষণ অব্যাহত রেখে উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে থাকে। মার্কসবাদ অনুসারে একমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরই উদ্বৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে শ্রমিক শোষণের অবসান ঘটতে পারে।

সমালোচনা ঃ

বিরুদ্ধবাদীগণ মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। যেমন -

১) মানব সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কস অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর অতি মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানই এককভাবে ইতিহাসের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। অর্থনৈতিক উপাদানের মত ধর্ম, দর্শন, প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ও যে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারাকে প্রভাবিত করতে পারে, মার্কস তা উপলব্ধি করেন নি। মানুষের কর্ম প্রেরণার উৎস কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে বর্তমান এমন নয়; ধর্মবোধ, আদর্শ, ভাবাবেগ প্রভৃতিও মানুষকে কর্মপ্রেরণা যোগায়।

২) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় সমাজের সকল ইতিহাসকে দুটি দ্বন্দ্বশীল শ্রেণীর সংঘর্ষের ইতিহাস হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ধারণাও সঠিক নয়। মানব ইতিহাসে দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছাড়াও সহযোগিতা-সম্প্রীতির নজিরও কম নেই। তা ছাড়া সমাজে বিত্তহীন ছাড়াও বহু মধ্যবিত্ত শ্রেণী থাকে যারা পরস্পর-বিরোধী সর্বহারা বা বণিক শ্রেণীর অর্ন্তবভুক্ত নয়।

৩) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অসম্পূর্ণ মতবাদ। কারণ উৎপাদনের উপাদানসমূহের পরিবর্তনের মূল কারণের সন্ধান এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। অথচ উৎপাদনের উপকরণগুলির পরিবর্তনের কারণ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে ইতিহাসকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

৪) অর্থনীতি যেমন দার্শনিক তত্ত্ব, আদর্শ প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সাম্যবাদী আদর্শের দ্বারা পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতি প্রভাবিত হয়েছে। সমালোচকরা তাই অর্থনীতিকে বনিয়াদ এবং দার্শনিক তত্ত্ব, আদর্শ প্রভৃতিকে উপরি-কাঠামো হিসাবে স্বীকার করতে চান না। আবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়াও অনেক সময় নতুন ভাবধারা ও মতাদর্শের ভিত্তিতে নতুন সমাজের উদ্ভব হয়।

৫) উৎপাদনের উপাদান সমূহের মালিকানা যেমন মানুষকে ক্ষমতাশালী করে, তেমনি বুদ্ধি-বৃত্তি, দূরদর্শিতা, সাহস প্রভৃতি গুণাবলীর গুরুত্বও এক্ষেত্রে কম নয়। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যিনি বা যাঁরা ক্ষমতাসীন হন তাঁর বা তাঁদের এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক উপাদানের কথা বলা যায় না। আবার মধ্যযুগে পোপের অবিসংবাদী কর্তৃত্বের কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক উপাদানকে নির্দেশ করা যায় না।

৬) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে যে দ্বন্দ্ববাদের কথা বলা হয়, তারও সমালোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের অবিরাম গতিধারায় 'বাদ', 'বিবাদ' ও 'বিসম্বাদ' সম্পর্কিত মার্কসীয় ব্যাখ্যা সর্বাংশে সত্য নয়।

৭) ঐতিহাসিক বস্তুবাদে সমাজের গুণগত পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব অনিবার্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের মতে, সংস্কার ও বিবর্তনের মাধ্যমে কাম্য পরিবর্তন ঘটে।

৮) উৎপাদন ব্যবস্থা অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের সভ্যতার সৃষ্টি সম্ভব। মানব ইতিহাসে এমন নজির আছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

তবে এতসব সমালোচনা করা সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে মানবসমাজের বিবর্তনের ধারায় অর্থনৈতিক শক্তি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে অন্যান্য উপাদানের ভূমিকাকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। এঙ্গেলসও পরবর্তীকালে একথা স্বীকার করেছেন। অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও উপরিকাঠামোর পাস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপরিকাঠামোর অর্ন্তভূক্ত বিভিন্ন উপাদানের কথা মার্কসবাদে অস্বীকার করা হয় নি। অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তিতে রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মগত, আইনগত বিকাশ ঘটে।

তবে এগুলি পরস্পরকে এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদকে প্রভাবিত করে। মানবসমাজের ইতিহাসে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য এটিও অস্বীকার করা যায় না। এঙ্গেলসের মতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব - এই দুটি বিরাট আবিষ্কারের জন্য আমরা মার্কসের কাছে ঋণী। এই দুটি আবিষ্কারের জন্য সমাজতন্ত্র হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান। লেনিনও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে এক বিরাট অগ্রগতি হিসাবে গণ্য করেছেন। অনেকের মতে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদই হল রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মার্কসের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। আসলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের করা সমালোচনার অধিকাংশই ভিত্তিহীন এবং একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ